'নদী মাটি অরণ্য': প্রকৃতি মানুষ সময়ের ইতিকথা

নির্মাল্য মন্ডল

'সেখানে নিভৃত অবকাশে তুমি
সংগ্রহ করেছিলে দুর্গমের রহস্য,
চিনছিলে জলস্থল-আকাশের দুর্বোধ সংকেত,
প্রকৃতির দৃষ্টি-অতীত জাদু
মন্ত্র জাগাচ্ছিল তোমার চেতনাতীত মনে।
বিদ্রুপ করছিলেন ভীষণকে
বিরূপের ছদ্মবেশে,
শঙ্কাকে চাচ্ছিলে হার মানাতে
আপনাকে উগ্র ক'রে বিভীষিকার প্রচন্ড মহিমায়
তান্ডবের দুন্দুভি নিনাদে।।'

— 'আফ্রিকা', রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ে 'নদী মাটি অরণ্য' উপন্যাসটি বাংলা সাহিত্যের একটি ইতিহাসাশ্রয়ী মহাকাব্যিক রচনার উদাহরণ। অবশ্য সম্পূর্ণ কাহিনিটা এক দীর্ঘ ইতিহাসের প্রথম ভাগ 'আদিকান্ড জমিন হাসিল'; অন্য দু'টি পর্ব— 'পত্তন পর্ব' ও 'তেভাগা পর্ব' মিলিয়ে একশ বছরের ইতিহাসের ধারাবিবরণীতে এই বৃহৎ প্রয়াসের সমাপ্তির পরিকল্পনা একে মহাকাব্যিক ব্যপ্তি দান করেছে। অবশ্য ঐতিহাসিক ধারাবিবরণী বললে এর সম্পর্কে সবটা বলা হয় না; ইতিহাস তো তথ্যমাত্র; কাহিনীর অন্তর্ভুক্ত মানুষের কাহিনী তথ্যকে প্রাণবন্ত করে তুলেছে। সংগ্রাম-প্রেম-প্রতিশোধ-স্বপ্ন-বঞ্চনা-হিংস্রতা সুখ-দুঃখ নিয়ে বিচিত্র যে জীবনপ্রবাহ এখানে স্রোতোধারার মতো বহমান তাই-ই এই কাহিনীকে ইতিহাস নদীখাতের সীমানা ছাপিয়ে বৃহত্তর জীবনসমুদ্রে উপস্থিত করেছে। সেখানে আঞ্চলিক ভূগোল, বৃহৎ এক রাষ্ট্রের একাংশের ইতিহাস, পরিবর্তনমুখী জীবন, চিরন্তন মানবস্বভাবের নানামুখী বৈচিত্র্য, প্রকৃতি-মানব সম্পর্ক— চমৎকার গল্প রসের মধ্য দিয়ে নিটোল আকার নিয়েছে এই রচনায়, যার নাম— 'নদী মাটি আরণ্য'।

রাম বা রামচন্দ্র। বাইশ বছর বয়সের এক সদ্য-যুবা বাবার আদেশে সুন্দরবনের অজানা জগতের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। তার বাবার এবং তারও জীবনটা ধ্বংস করে দিয়েছে বুনো সামন্ত ও তারপর পালিয়ে গেছে সুদূর নদী-দ্বীপ-অরণ্য সঙ্কুল দূরবর্তী এক স্থানে, যার নাম সুন্দরবন। সেখানেই যৌবন প্রাপ্ত রামচন্দ্রের অভিযান— আদিম প্রতিবেশে

বন্য মানুষেরই মতো জিঘাংসা চরিতার্থ বাসনায়। অতঃপর শস্যবহুল নরম জল-মাটির দেশ থেকে পাড়ি দেওয়া এক যুবকের ভিন্ন প্রকৃতি মানুষ, অর্ধ-সভ্য পরিবেশ থেকে প্রাপ্ত অভিজ্ঞতা কীভাবে সুতাহাটার মোটামুটি সম্পন্ন ঘরের প্রায় জীবন না দেখা সরল অপরিণত মনকে পরিণতি দিল, সেই পরিণতির চাপ ও পরিণামই বা কেমন— সেই সেই কাহিনি নিয়েই গড়ে উঠেছে এই উপন্যাস।

এই উপন্যাস আবিষ্কারেরও গল্প। সুন্দরবনের মাইল মাইল বিস্তৃত অরণ্য উৎখাত করে জমিন হাসিলেরও গল্প; জমিনের লোভে, একটু সম্পন্ন জীবনের আকর্ষণে সাধারণ মুনিশ খাটা মানুষ থেকে শুরু করে আরো আরো বড়লোক হবার জন্য হাজার হাজার বিঘে জমি ইজারা নেওয়া উঠতি জমিদার— সকলেরই দৃষ্টি পড়েছে এই নতুন ভূমিখন্ডের দিকে যা এ পর্যন্ত মানুষের মনোযোগ-সীমার থেকে বহু দূরবর্তী প্রান্তে পড়েছিল। সমুদ্র-নদী-অরণ্যঘেরা এই বিচিত্র জগৎকে প্রকৃতি বহুকাল জনচক্ষুর অন্তরালে গোপন রেখেছিল। সেই নোনাজল, হিংস্র আদিমতায় পূর্ণ জঙ্গলকে মানুষ প্রথম অষ্টাদশ শতকে আবিষ্কার করতে উদ্যোগী হয়— অবশ্যই নিজের লোভের, স্বার্থের খাতিরে। অতএব একদিকে শুরু হল জমি বিলি করে প্রজাবসতি-চাষাবাদ-খাজনা আদায় আর অন্যদিকে সাধারণ মানুষের জমিজিরেত ঘর বসতির মধ্য দিয়ে এই নতুন ভূমিখন্ডকে আবিষ্কার-বাসনা—

"কত জঙ্গল কত নদী দিয়ে গড়া এই জল জঙ্গলের দেশ। কত রহস্যের অলিগলি ছুঁয়ে আছে এইসব সবুজ সোঁদা মাটির দ্বীপগুলি।"

নতুন জনপদ গড়তে ছিন্নমূল মানুষের হাতেই অতঃপর গড়ে উঠল সুন্দরবনের জনজীবন। সাগরদ্বীপ থেকে শুরু— তারপর লাটের পর লাট— সুন্দরবনের মানচিত্র থেকে সবুজ উধাও হয়ে সেখানে হলুদ রঙের ছোপ ক্রমশঃই বাড়তে থাকে— জমিন হাসিলের চিহ্ন। নবাগতদের সহজে জায়গা ছাড়েনি আদিম অরণ্য; বাঘ-সাপ-কুমিরের সঙ্গে হিংস্র লড়াই, অচেনা পরিবেশে নিঃসঙ্গ দিনযাপন, প্রকৃতির বিরুদ্ধতার সঙ্গে মানিয়ে নিতে নিতে ক্রমে নিজেদেরই বদলে ফেলতে থাকা; শুধু জমির জন্য নয়— সময়ের সঙ্গে এই পরিবেশের প্রতিও আকর্ষণের বন্ধন তৈরী হওয়া; এতো শুধু সোঁদরবন নামক রহস্যঘেরা কিংবদন্তীর দেশকে চেনা নয়— এর মধ্য দিয়ে জীবনের নতুন নতুন সীমানাকে স্পর্শ করা— একরকমে প্রতিটি মানুষের আত্মআবিষ্কারও বটে। যে রাম তার বাইশ বছরের জীবনে কৃষকের ঘরের ছেলে হয়েও কোনোদিন হাতে লাঙল ধরেনি তারই হাতের কুড়ুলের ঘায়ে ক্রমশঃ মাটি নিতে থাকে প্রাচীন বৃক্ষের দল। আর নরম-সরম সরল চেহারায় শুধু বন্যভাবই আসে না, বাইশ বছরের বিস্ময়-ভরা সোজা-সাপটা মনের মধ্যেও সুন্দরবনের নোনাজল, গহীন অরণ্যের নিবিড় অন্ধকার ঢুকে পড়ে; বদলে যেতে

থাকে রাম; আত্ম-আবিষ্কারের এক নতুন পর্ব বেয়ে জীবন তাকে টেনে নিয়ে চলে। শুধু কি রাম? মহিমবাবু, বংশী, বিভাবরী, নকুলখুড়ো, প্রত্যেক চরিত্রই তো সুন্দরবনের জল-জঙ্গলের দেশে এসে বদলে গেছে; নিজেদের নতুন নতুন পরিচয়ের মধ্যে নিজেদেরই নতুনভাবে চিনেছে; সময় বিশেষে বদলে গেছে অস্তিত্বের চিহ্ন পরিচায়ক নামটিও।

নদীমাতৃক বাংলাদেশের মানুষের কাছে নদী বড় আপনজন; নদীর তীর ধরেই তো গড়ে ওঠে গ্রাম-শহর-বন্দর-সভ্য জীবন। কিন্তু সুন্দরবনের নদী মানুষের ঘরের লোক নয়— মিষ্টি জলের পরিবর্তে তার নোনাজলে সমুদ্রের গন্ধ; গৃহস্থের শান্ত সংসারের সঙ্গে তার একাত্মতা নেই। সুন্দরবনের নিকটবর্তী হয়ে নদীর পরিচয় পালটিয়ে যায়—

এখন তার গন্ধ কেমন অদ্ভুত, মন-পাগল করা। নোঙরের দড়ি ছিঁড়ে উধাও হওয়ার মতো। হয়তো সমুদ্দরের গন্ধ এমনই উদাস, আকুলবিকুল হয়।

এই নদীর মধ্যে আদিম হিংস্রতাও প্রকট; বর্ষায় মোটা ময়াল সাপের মতো শরীর বাঁকিয়ে সে জনপদের শান্ত সুখী জীবনকে প্রবল আক্রোশে ধ্বংস করতে চায়। তার জলের মতো স্বভাবেও মিষ্টতা অনুপস্থিত। একমাত্র আদিম অরণ্যের সঙ্গেই তার সমপ্রাণতা; মোহনায় এসে অজস্র খাঁড়ি সৃষ্টি করে নদী জঙ্গলের দেহের গভীরে ছড়িয়ে যায়, দশ আঙুলের মুঠিতে আঁকড়ে ধরে বুনোমাটি; বহিরাগত জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে একত্রিত হয়ে এ যেন তাদের যুদ্ধ ঘোষণা।

তবুও নদীই এই অঞ্চলের প্রাণশক্তির সঞ্চারক। জলপথ বেয়েই এক লাট থেকে অন্য লাটে ঘোরে ডিঙি, বাহিত হয় খবর; কেচ্ছা-কেলেঙ্কারি থেকে শুরু করে প্রতিটি লাটের হাঁড়ির খবর জানাজানি হয়। আবার এই নোনাজলের স্রোতেই মিশে যায় নকুল খুড়োর প্রাণবায়ু, লবঙ্গলতা বিদ্যুৎবালাদের অশ্রু। নদী তো সভ্যতার জননী; কিন্তু মেঘনা, মুড়িগঙ্গার মতো নদী মানুষকে আমল দেয় না; মিষ্টি জলের সঙ্গে সন্ধি হয়নি নোনা সমুদ্রের। তাই নদী সংলগ্ন জনজীবন, চাষের ভূমি এখানে বারবারই গড়ে ওঠে আর বারবারই ভেঙে যায়। প্রতিষ্ঠিত মানবসমাজ থেকে প্রত্যাখ্যাত মানুষের দল তাদের বেদনা-ক্ষোভ-হতাশা নিয়ে এই নদীপথেই এসে নোঙর বাঁধে অজানিত দ্বীপে; মোহনায় উপস্থিত নদীরই মতো অতল অনিশ্চিত জীবনের ঢেউ-এর সঙ্গে তাদের সংঘাত শুরু হয়; মুছে যায় পেছনের ফেলে আসা দিন-পরিবার-সংসার-সম্পর্ক। এককালের গৃহী মানুষের চরিত্র বদলে প্রায় বুনো-বর্বর-আকার ধারণ করে। নদীও তো পিছু ফেরে না।

'মাটি বাপের নয়, মাটি দাপের'। সভ্যতার প্রাচীন লগ্ন থেকেই পৃথিবী জুড়ে এই মাটি দখলের লড়াই। ভারতবর্ষের ইতিহাসেও বারবার বহিরাগত শক্তির জমিদখলের ঘটনাটি ঘটেছে। শুধু কৃষিভূমি বলেই নয়, মাটির ওপরেই তো গড়ে ওঠে কোনো মানুষের

আত্মপরিচয়; আর অস্তিত্বের শিকড় ছড়িয়ে যায় নির্দিষ্ট মাটিতেই; মাটিই মানুষের রাষ্ট্রনৈতিক সীমা, সাংস্কৃতিক কাঠামো, জীবনগত নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দেয়। আর কৃষিকেন্দ্রিক দেশে 'জমিজিরেত' তো সর্ব অর্থেই মানুষের উন্নতি ও নিরাপত্তার মূলধন।

সুন্দরবনের মাইল মাইল বিস্তৃত কুমারী অরণ্যভূমির দিকে অষ্টাদশ শতকে প্রথম ইংরেজ শাসকের শ্যেনদৃষ্টি পড়ে। অতঃপর দীর্ঘসময়ের লিজে জমি বিলি, অরণ্য-উচ্ছেদ, রাজস্ব আদায়ের মধ্য দিয়ে তারাই প্রথম কুমারী মাটির ঘুম ভাঙানোর আয়োজন করে। জমির টানে গরীব মানুষ থেকে উঠতি জমিদার শ্রেণির নিযুক্ত কর্মচারীদের একের পর এক আগমন; মাটির আব্রু মুক্ত করে তাকে দখলের ও কর্ষণের আদিম লড়াইতে সামিল সব শ্রেণির মানুষজন। 'জমিনের সঙ্গে মানুষের অধিকার তো জন্মগতই'। জমি আর নারী প্রায় একইরকম কারণে এ গল্পে সমার্থক হয়ে গেছে। জোর করে অন্যের নারীকে ভোগ দখল করতে চাওয়া মানুষের ভিড় এখানে। আবাদের প্রচলিত কথা— 'নোনাজলের খিদে' হওয়া অর্থাৎ নারী আসঙ্গ কামনা—

'কাঠির আবাদে এইস্যা খিদ্যা বেইড়ে যায়। যেমন জমিনের খিদ্যা, তেমনি মেয়েছেলের খিদ্যা, দুয়েটো বেইড়ে যায়।'

মুনিশদের মেয়ে বৌদের ভোগদখল করে ক্ষমতাবান নায়েবেরা; লবঙ্গলতা, বিদ্যুৎবালা, টগর-বৌ, কমলিপিসি, সকলেই কোনো না কোনোভাবে পুরুষের দখলীকৃত অস্তিত্ব। পাঁচির চোখে যে বুনো কামনা তাও নোনামাটির আবহের সঙ্গে সমীকৃত। সভ্যতার নিজস্ব নিয়মেই যেন মাটি আর নারী নিয়ে পৃথিবীর প্রাচীনতম লড়াই এই সদ্য অবিকৃত বন্য পরিবেশের মধ্যে আকার নিয়েছে।

'কত মানুষ কত ফিকির নিয়ে ঘর ছেড়ে, দেশ ছেড়ে, ছেলে-মেয়ে-বউ ছেড়ে ডিঙিতে ভাসতে ভাসতে গিয়ে ঠেক খেয়েছে সোঁদরবনের গহন প্রান্তরে'।

'সেঠিহাওয়ায় জিনপরিরা ওড়ে। রেতে দোরগোড়ায় এসে ঠেলা মারে'।

'এই হেমন্তের দুপুরে সারা গায় রোদ মেখে টং হয়ে রয়েছে ঘোষড় জঙ্গল, বাইরে থেকে দেখে বোঝবার উপায় নেই তার পেটে পেটে এতো ষড়যন্ত্র।'

জলাজমি অরণ্যের দেশ সুন্দরবন; তাকে নিয়ে প্রবাদ বিস্ময় কৌতূহল সাধারণ জনপদবাসীর। আসলে চেনা ভূমি-পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন, আপনাতে আপনি আত্মগত এই জঙ্গল শহুরে ঠিকানাকে গ্রহণ করতে চায়নি। তবু এর ওপর বহিরাগতের জুলুম, অনুপ্রবেশ তার ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যের অপমান। তাই সুন্দরবন মানুষকে আপন করতে চায় না, তার শূল ওঠা কঠিন মাটি দিয়ে আঘাত করে; তার গা-শিরশিরে আঁধার থেকে নিঃশব্দ মৃত্যু এসে থাবা মারে; গাছের ডাল থেকে নেমে আসা হিলহিলে শীতল স্পর্শ মানুষকে

লহমায় চিরকালের জন্য ঘুম পাড়িয়ে দেয়। বন কাটার সূচনা থেকেই অরণ্য আর মানুষে এই নীরব সংঘর্ষ চলছেই। বনবিবি আর দক্ষিণরায়ের নিজস্ব রাজত্বে মানুষের প্রভুত্ব যত বিস্তৃত হচ্ছে, তত পিছিয়ে পড়া জঙ্গল তার সম্পদ হারাতে হারাতে ক্রমশঃ একরোখা হয়ে চরম মার দিতে চাইছে—

'জঙ্গলের দখল ছাড়ছে বটে বন্যজন্তুরা, সঙ্গে সঙ্গে তাদের করও তুলে নিচ্ছে প্রতিটি কাছারি থেকে।'

সভ্যতার সঙ্গে প্রকৃতির এই চিরন্তন দ্বন্দ্বের মধ্যেও কি কোথাও মিল হয় না? যে মানুষ অরণ্যের কাছে আত্মসমর্পণ করে, তার বশ্যতা মানে— প্রকৃতির ধীর মন্থর প্রভাবে সে-ও একদিন এই অরণ্যকে আমারই একজন হয়ে ওঠে। যেমন হয়েছে রাম, তারিণী, মহাদেব, চিনিবাস, একাদশী প্রমুখ—

'এ রামচন্দ্র সোঁদরবনের। দীর্ঘমেয়াদের বনবাসে এসে সে বদলে গেছে পুরোপুরি।... সেও এখন একজন আদিম মানুষ ছাড়া আর কেউ নয়।'

এক বিপুল গভীর রহস্যময় অরণ্য তার আদিম পরিসরের মধ্যে আকাশ-জল-গাছ-গাছালিকে নিয়ে আপন মনে ধ্যানস্থ ছিল সেই কোন প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে। যে মানুষ তাকে সন্ত্রস্ত করেছে বিনিময়ে তাকেও সে সন্ত্রাস ফিরিয়ে দিয়েছে। তবুও এই বন্যপ্রাণী, হিংস্র সরীসৃপ, পদে পদে রহস্যময় বিভীষিকা, প্রবাদ, কিংবদন্তী, নোনামাটি আর দুর্ভেদ্য গরান-গেঁউয়া-শর-হোগলার জটাজালে ঘেরা অরণ্যের নিজস্ব একপ্রকার আকর্ষণী শক্তি, সৌন্দর্যময় ব্যক্তিত্ব আছে। যে মানুষ গভীর থেকে চিনতে পারে, — পূর্ণিমা অমাবস্যার বানভাসি সৌন্দর্যে, নিবিড় গাছ-গাছালির সবুজাভ অন্ধকারে, নোনা মাটির পাকে চক্রে সে একবার জড়িয়ে পড়ে— তার মধ্যে ধীরে ধীরে শিকড় চালিয়ে দেয় সুন্দরবন। শিক্ষিত, বেপরোয়া মহিমবাবু থেকে শুরু করে পিতৃ সত্য রক্ষা করতে আসা সদ্য-যুবা, বিহার-ছোটনাগপুরের সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিবেশ থেকে আসা জীবিকান্বেষী সাঁওতালকুল— ক্রমশঃ এই অরণ্যকেই তাদের ভবিতব্য বলে মেনে নিয়েছে। ধ্বংস হতে হতেও নিজের অমোঘ টানে জঙ্গল সম্মোহিত করে ফেলেছে অজস্র মানুষকে। নিজে ফুরিয়ে যেতে যেতেও নিজস্ব অন্ধকার আদিমতা, ক্রুর প্রতিহিংসা, উদাস দার্শনিকতা, রহস্যময় বন্যভাবকে সে মানবীয় উত্তরাধিকারের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছে। পাঁচি, রামহরি জানা, রম্ভা, অক্রুর, বংশী, নকুল, রাম— সকলেই কোনো না কোনোভাবে অরণ্যের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়েও ক্রমশঃ তার স্বভাবের অংশীদার হয়ে উঠেছে নিজেদের অগোচরেই।

কাহিনিতে সময়ের ইতিহাসও ধরা রয়েছে। ইংরেজ ঔপনিবেশিকতাবাদ কীভাবে ধীরে ধীরে গ্রাস করছে দেশের প্রান্তিক এলাকাকেও— তারই স্পষ্ট তথ্যগত বিবরণ

বিবৃত হয়েছে। একদিকে উনিশশতকীয় বাংলাদেশে বাবু কালচারের দ্বারা দূষিত সাংস্কৃতিক পরিবেশ, অন্যদিকে তারই মধ্যে থেকে বিদ্যাসাগর, বঙ্গদর্শন, নীলদর্পণের উল্লেখে এক স্বর্ণময় সম্ভাবনার ইঙ্গিত; বোঝা যায় শহরাঞ্চলেও চলছে একধরণের সংঘাত— সমাজ-সংস্কৃতির প্রেক্ষাপট সেখানে ক্রমেই বদলাচ্ছে; অন্যদিকে ইংরেজ ঔপনিবেশিকতার ক্রমবিস্তারের হাতিয়ার হয়ে এদেশেরই জমিদার-নায়েব প্রমুখ অর্থ ও ক্ষমতাবান মানুষের দল শোষণ ও ত্রাস সঞ্চারের মাধ্যমে সাধারণ হতদরিদ্র সরল মানুষকে শ্রমদাস হয়ে থাকতে বাধ্য করছিল। সুন্দরবনের জমিন হাসিলের বিস্তৃত ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক তথ্যগত বিবরণ এখানে রয়েছে— যা কাহিনিকে সমৃদ্ধ করার পাশাপাশি ঐ দ্বীপভূমিকে ঘিরে দীর্ঘকালের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক টানাপোড়েনের ইতিবৃত্তে আঞ্চলিক সত্তার পূর্ণ পরিচয়টিও বিধৃত হয়েছে। ভারতবর্ষের দরিদ্র জনজীবন শাসক ও ক্ষমতাবানের দ্বারা ধ্বস্ত হওয়ার চিরন্তন সত্য শুধু নয়, এদেশীয় ইতিহাস ধনী-দরিদ্রের মেরুপ্রতিম আর্থিক বৈষম্যের ইঙ্গিতটিও এখানে প্রকট। উপন্যাসে শেষ অবধি প্রকৃতি সংলগ্ন নিরুপায় অথচ সংগ্রামী মানুষের গল্পই প্রাধান্য পেয়েছে। প্রকৃতি-মানুষ-নিয়তি-সকলের সঙ্গে লড়াই করে বাঁচতে চাওয়া সেই মানুষের ইতিহাস— সময়ের চলমানতার মধ্যে শেষ পর্যন্ত পাঠক হৃদয়ে স্থায়ী প্রভাব রেখে যায়।—

'মানুষ কখনও জঙ্গল কেটে, কখনও পতিত জমি উদ্ধার করে, কখনও সমুদ্র পাড়ি দিয়ে নতুন দ্বীপ বা দেশ আবিষ্কার করে নতুন নতুন পত্তন গড়ে তুলেছে নিজেদের মেহনতে, লাগাতার কঠোর পরিশ্রম করে, ভয় বিপদ তুচ্ছ করে।'

সুন্দরবন যেন নির্বাসিত বিতাড়িত মানুষের কলোনি। অক্রুর-ডুংরীর মতো আদিবাসী সাঁওতাল মুন্ডা, চিনিবাস-মহাদেব-কালুর মতো দরিদ্র সম্প্রদায়, টগর-বৌ-মহিম-যুধিষ্ঠির-বিভাবরী-সীতাবালা-কমলির মতো অবৈধ সম্পর্কে জড়ানো সমাজ- প্রত্যাখ্যাত মানুষ, জমি দখলের নেশায় বিভোর তারিণী-রামহরি-প্রহ্লাদের দল কিংবা নকুল খুড়ো- বংশীর মতো সংসারে মন না বসা উদাসী মানুষজনের আনাগোনায় পূর্ণ এই জলা-জমির দেশ। বিচিত্র স্বভাব ও বিভিন্ন পরিচয়ের সূত্রে আসা মানুষ-জনকে সুন্দরবনের নদী-মাটি-অরণ্য একযোগে বেঁধে ফেলেছে। নায়েব-গোমস্তাদের মতো সম্পন্ন কিছু মানুষকে বাদ দিলে বাকিদের মধ্যে আর বিভেদ থাকে না। সাঁওতাল অক্রুর-ডুংরী-গম্ভীরদের সঙ্গে বংশী-রাম-মহাদেবরা অনায়াসে মিশে যায়। তারিণীর মতো সম্পন্ন কৃষক-সুতাহাটায় যার নিজস্ব ঘর-বসত, জমি-জিরেত আছে— টোঙ্গের ঘরে অর্ধ-সভ্যপ্রায় জীবনের সঙ্গে সে অনায়াসে একাত্ম হয়ে যায়। সাগরদ্বীপে অনেক জমির মালিকানা পাওয়া ভদ্র-গৃহস্থ ষষ্ঠীচরণের কথায়-আচরণেও পালিশহীন অশিক্ষিত মানুষের ছোঁয়া; অতীত পরিচয়কে মুছে ফেলে

প্রতিমুহূর্তে নতুন পরিবেশের মধ্যে নিজেকে প্রতিষ্ঠার লড়াইতে সামিল মানুষগুলি মিলেমিশে একটি নিজস্ব জনজাতিগত পরিচয় গড়ে তুলেছে। পাশাপাশি গড়া ঝুপড়ির মধ্যে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে থাকা মানুষজন, রাত্রির হিম-অন্ধকারে আগুন জ্বেলে বাঘের সঙ্গে লড়াই করা, কুড়ুল হাতে একযোগে জঙ্গল সাফাইয়ে সামিল হওয়া জনশক্তির মধ্যে বিপদ-অনিশ্চয়তা আর সংগ্রামে ভরা জীবন ঐক্য নিয়ে এসেছে। বন্য বর্বর যুগে আদিম মানুষ গোষ্ঠীগতভাবে বাস করতো, একত্রে পশু শিকার, খাদ্য ভাগাভাগি করে চলতো, তাদের যূথবদ্ধ জীবনের ছায়াই পড়েছে নতুন বসতি গড়ে উঠতে চলার মুখে—

'... পশ্চিম আর উত্তরদিকে ঘেঁষাঘেঁষি করে যে ঘাটে সত্তরটা ছোট ছোট ঝুপড়ি গড়া হয়েছে ভারী অবহেলায় যার ভেতর ঠাসাঠাসি করে বাস করে মুনিশরা। তাদের কেউ বউ ছেলেমেয়ে নিয়ে থাকে, যারা একলা মানুষ তারা থাকে দল বেঁধে। তারা সবাই এখন বাঘের হাঁ-মুখের সামনে।'

তবু সভ্য সমাজ গড়ে ওঠার প্রাথমিক লক্ষণগুলিও এখানে প্রকট, মানুষের হাতে গড়া সভ্যতার আদিম সাম্যবাদী সমাজ ব্যবস্থা এখানে নেই; হওয়া সম্ভবও নয়। কারণ এখানকার বাসিন্দারা অধুনা অরণ্যবাসী হলেও সমাজ-সংস্কার এদের জন্মসূত্রে রক্তে এবং পূর্ব জীবনের অভিজ্ঞতাসূত্রে মনে জাগরুক; তাই কাছারি বাড়ির সীমানা গরান-ঝাউ খুঁটি দিয়ে গড়া শক্ত উঁচু প্রাচীরের ঘেরাটোপে আর পেয়াদাদের সতর্ক প্রহরায় সম্পূর্ণ নিরাপদ; অধস্তন কর্মচারীদের উঁচু গাছের ডালে টোঙ্গের বাসা খুব আরামপ্রদ না হলেও সেখানে নিরাপত্তা কিছু কম নেই। শুধু মুনিসরা বাস করে বাঘের হাঁ-করা মুখের সামনে। উঁচু-নিচু ভেদের এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে মাঝে মাঝেই বিপদ-তাড়িত মুনিসদের মধ্যে থেকে ক্ষুব্ধ শোরগোল ওঠে—

'জঙ্গল কাটা শেষ হইবু, আর সব মুনিসগুলান একটো একটো কর্যা তেনাদের পেটে যাবু। তখন নায়েববাবু, গোমস্তাবাবুরো সব মজা কর্যা জমিজিরেত লুট্যেপুট্যে খাবু। বাবুগণের কত বুদ্ধি!'

কিন্তু এই প্রতিবাদও সঙ্ঘবদ্ধ হবার অগে থামিয়ে দেওয়ার কৌশলটিও খুব চেনা-সভ্য সমাজ থেকেই সংক্রামিত। চাবুকের মারের সঙ্গে শোষণ অত্যাচারের অন্য ছবিগুলিও এখানে উপস্থিত। বরাদ্দ চাল-ডাল বন্ধ করে দেবার হুমকি, কম মজুরি, জমিন হাসিলের পর জমি দেবার মিথ্যা প্রতিশ্রুতি— এসবের সামনে জমিদার আর ছোট-বড়ো ইজারাদারদের অধীনে জীবনভর মুনিসগিরি করে যাবার ভবিতব্য নিয়ে বেঁচে থাকা দরিদ্র মানুষের আর্থ-সামাজিক ইতিহাসের ছবিটিও খুব পরিচিত। শেষ পর্যন্ত লক্ষ্মণচন্দ্র, রামহরি জানা, বিভীষণ সামন্তরা জমিনের সীমানা বাড়িয়েই চলে— আর রাম-বংশী-গণপতির

মতো সরল মানুষগুলির একটুকরো জমিনের স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যায়। তারা ভাবে—

'এত জমিন একজন মানুষের কী কাজে লাগবে!'

উত্তরটা শিক্ষিত সমাজ-সচেতন মহিমবাবুর কাছ থেকেই মেলে—

'মানুষের আকাঙ্খার কোনও শেষ নেই। আরও জমি মানে আরও একটু ক্ষমতা। মানুষের নেশা হল আরও ক্ষমতার জন্যে দৌড়ুনো। দৌড়ুতে দৌড়ুতেই মানুষ একসময় দম ফুরিয়ে মরে যায়, তবু দৌড়ুতে ছাড়ে না।'

মানুষের রচনা করা সমাজের অনিবার্য বিভেদ ও তৎ সম্পৃক্ত অন্যান্য দোষগুলিকেও এই আরণ্যক সমাজ ব্যবস্থা এড়িয়ে যেতে পারেনি।

সুন্দরবনের বাদাবনের জগৎ বাকি বাংলাদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন এক আদিম ভূমি সত্তা। মেঘনা-কালনাগিনী-মুড়িগঙ্গার মতো অজস্র নদীর জল বিস্তৃত হয়ে তাকে সুরক্ষিত রেখেছে; শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যভূমি তার স্বাতন্ত্র্যের প্রহরী; সেখানে যারা বাস করতে যায়, সভ্য-পরিচিত জগতের সঙ্গে একরকম বিচ্ছিন্নতা তার ক্ষেত্রে অনিবার্য হয়ে ওঠে। গাছের ওপরে বাঁধা টোঙ্গে বাস, দড়ি বেয়ে ওঠানামা, কুডুল-কাঁড়ি নিয়ে বুনো জন্তুর সঙ্গে মুখোমুখি লড়াই, নরনারীর যথেচ্ছ যৌনমিলন, প্রতিহিংসার বুনো আক্রোশে ঘেরা, অনেকটাই প্রাগৈতিহাসিক জীবন যাপনে অভ্যস্ত এই জগৎ বাকি পৃথিবীর কাছে রহস্যময় ত্রাসস্বরূপ। শহুরে জগতের মানুষ এখানে পা রাখতে ভয় পায়। বাবু লক্ষ্মণচন্দ্র আর তাঁর সঙ্গী সাথীরা পানীয়ে আশ্চর্য পূর্ণ হয়ে বারবণিতা সমভিব্যাহারে দু'দিন দেদার ফূর্তি করে যান, কিন্তু আদিম জঙ্গলে পা রাখেন না। শহর আর সভ্যতার সঙ্গে দূরত্ব তাই থেকেই যায়; বিবর্তিত সময় এই ভূমিজ পরিবেশকে পুরোপুরি গ্রাস করতে পারে না। সভ্যতার প্রাথমিক ধাপটুকু গড়ে উঠেও বারবার ঝড়-বন্যা-প্রলয়ের মুখোমুখি হয়, নস্যাৎ করে দেয় মানুষী ষড়যন্ত্রকে। আদিম প্রাকৃতিক শক্তির সঙ্গে সভ্যতার এই লড়াই তো আজও অব্যাহত।

' সোউটো গরম জঙ্গল। এখুনও কাটাই হয় নি। মানুষখেকোরা সেঠি রোজ রাতের বেলায়, কি বিহানে পজ্জন্ত মানুষের রক্ত দিয়্যা কুলকুচি করে। সেঠি যাইচ কাঁই!'

রাম পনেরো নম্বর লাটে যাবার মুখে এমন প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছিল। সুখী অভ্যস্ত নিরাপদ জীবন ছেড়ে কেউ সেই আদিম জল-জঙ্গলের দেশে যায় না। দেশ-গাঁয়ে কোনো পাপ কাজ করে পালিয়ে গিয়ে ডেরা বাঁধতে বাধ্য হয় কেউ কেউ; যেমন— বুনো সামন্ত, মহিম, যুধিষ্ঠির, লবঙ্গলতারা। আবার রামের মতো কেউ বুনো প্রতিহিংসা পূরণের সংকল্প নিয়ে বন্যভূমিতে আসে; আর আসে মুনিস খাটতে গরিব মানুষজন, আদিবাসী সম্প্রদায়, জীবিকাহীন দরিদ্র। এই সম্প্রদায় শুধু খিদের তাগিদে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে সমস্ত প্রতিকূলতাকে উপেক্ষা করে শ্রমসাধ্য কাজ করে যায়। রামহরি জানা, তারিণী মাইতির

মতো জমিদার শ্রেণি প্রতিনিধি কর্মচারীর দলও আসে; তবে তাদের প্রতিপত্তি, অর্থ, জমিদারের প্রত্যক্ষ মদত আর লোভ নিয়ে ভবিষ্যতে বড়লোক হবার স্বপ্ন বাকি মানুষগুলির থেকে পৃথক করে রেখেছে।

এই কাহিনির কেন্দ্রভূমিতে দক্ষিণবঙ্গের যে নোনা জল-মাটির-রাজত্বের কথা রয়েছে সেখানে সংঘাতের মূল পরিসরটিই বহির্মুখী এক অচেনা ভূমিতে নিজস্ব শিকড় চালিয়ে দিতে চেয়েছে কিছু শিকড়হীন অথবা পুরনো শিকড় থেকে বিচ্ছিন্ন মানুষ। ফলে আগন্তুক জনসমাজের সঙ্গে আরণ্যক জগতের লড়াই অনিবার্য হয়ে পড়ে। গরান-সুন্দরী-হেঁতাল-গর্জনের দল সারে সারে নুয়ে পড়ে। তবু পাল্টা মার আসে রাত্রির গভীরে নিঃশব্দ থাবায় কিংবা শীতল ছোবলের আকস্মিকতায়; আছে ঝড়-বন্যার মতো প্রাকৃতিক আক্রোশও। হাসিল হওয়া জমিকে চাষের উপযোগী করতে নোনাজল প্রতিরোধক বাঁধকে চুরমার করে দেয় বন্যা; তবু মানুষের তীব্র জেদ আর নিরুপায়তা তাকে জলা জমির একজন হয়ে ওঠার লড়াইতে সামিল রাখে— বছরের পর বছর। ব্যক্তিগত সংঘাতও কি নেই? রাম তার উরুতে বাঁধা হাঁসুয়ার ধারালো স্পর্শের মধ্যেই পিতৃসত্য পালনের উজ্জীবনী মন্ত্র খুঁজে পায়। নারীকে ঘিরে সংঘাত তো ঈশান সামন্ত, তস্য পুত্র রামচন্দ্র আর বিভীষণের মধ্যেই নয়, টগরের বুড়ো সঙ্গী আর বংশী এবং মহিম-রামহরির মধ্যেও দ্বন্দ্ব তৈরী করেছে। মানসিক দ্বন্দ্বও কাহিনিতে বড় কম নেই। সাগরদ্বীপে ষষ্ঠীচরণের সুন্দর গোছানো সংসার, ভদ্র গৃহস্থের জীবন রামকে আনমনা করে তোলে; বন্য জগৎ আর পিতৃসত্য পালনের দায়িত্বের সঙ্গে সুস্থ পরিপূর্ণ স্বাভাবিক মানুষের মতো বেঁচে থাকার ইচ্ছায় দ্বন্দ্ব বাধে বারবার।

সংঘাত আরো আছে। উনিশশতকে কলকাতা শহরে বাবু কালচারের পাশাপাশি বঙ্গদর্শন, নীলদর্পণ, হিন্দু কলেজ ইত্যাদির উল্লেখ ঘোলাটে রুচির সঙ্গে নব্য জীবন চেতনার মধ্যে দ্বন্দ্বের আভাস দেয়। সামাজিক দ্বন্দ্বের অন্যতর পরিচয় মেলে আরণ্যক পরিবেশেও। নায়েব-গোমস্তাদের নিরাপদ জীবনের পাশে বাঘের থাবায় মৃত মুনিসদের সঙ্গীরা নিজেদের অরক্ষিত অবস্থা নিয়ে প্রশ্ন তোলে—

'বাবুরা থাইকব্যে টোঙ্গে, মুরা থাকবু পোঙে!'

আর এই সব ঘটনাই কাহিনির অভিনবত্বকে ছাপিয়ে চিরন্তন সমাজ সমস্যার দিকগুলি প্রকট হয়ে ওঠে। আদিম আরণ্যক এই দ্বীপভূমি যেন একটুকরো মানব সভ্যতারই প্রতীক— নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে যার প্রাথমিক চেহারাটি রূপায়িত হতে চলেছে।

সমগ্র উপন্যাসের মধ্যে এক স্বতন্ত্র জীবন পরিবেশে মানুষী অধিকার প্রতিষ্ঠার ঘটনাই মূল স্থান পেয়েছে। দুই ধরণের দখলদারিত্বের কথা এখানে আছে; ইংরেজ কর্তৃক ভারতবর্ষ

অধিকার আর শাসকদের প্ররোচনায় বাইরের জনশক্তির দ্বারা কুমারী আদিম জমিন দখলের ইতিকথা। এর সঙ্গে আছে নারীকে অধিকার করারও গল্প। শহুরে এবং গ্রামীণ যে বৃহৎ বঙ্গদেশ তার সঙ্গে এই আঞ্চলিক সত্তার মিল হবে না। উপন্যাসটির পরতে পরতে অপরিচিত ভয়াল পরিবেশের রহস্যময়তা, নোনা জমির ধূ ধূ বিস্তার, ছমছমে নীরবতা এক ধরণের শিহরণ জাগানো অস্তিত্বকে জানান দেয়। যদিও প্রথাগত রোমাঞ্চকর অভিযানের কাহিনি এটি নয়; তবুও মসৃণ বহমান রূপের বাইরে জীবনের যে আরো অনেকগুলি দিক আছে এবং মানুষেরও— সেই বহুমাত্রিক জীবন-পরিবেশের আর এক অংশের সঙ্গে পাঠকের পরিচয় লাভ ও তার অভিজ্ঞতার সীমাবৃদ্ধিও এখানে ঘটেছে।

এই কাহিনির নায়ক রামচন্দ্র; পিতৃসত্য পালনের ভবিতব্য শৈশবেই তার ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল এই নামের মাধ্যমে। রামায়ণের কাহিনির মতোই মহাকাব্যিক বিস্তার এ গল্পের নায়কের জীবনেও; সীতা উদ্ধারে অচিন দেশে পাড়ি দেওয়া, পিতৃসত্য পালনের জন্য নির্বাসন গ্রহণ, বিপর্যস্ত দাম্পত্য, বন্য জীবনেও কিছু সুহৃদ লাভ, ব্যক্তিগত জীবনে অসীম নিঃসঙ্গতাবোধ,— এসবই আধুনিক রামচন্দ্রেও প্রাপ্তি। তবু সময়ের পরিবর্তনেই আধুনিক কালের মহাকাব্যও বদলে যায় অনেকটাই। আজকের সীতাকে হরণ করে নিয়ে যায় বিভীষণ; তার সঙ্গে স্বেচ্ছাগামিনী সীতার অগ্নিশুদ্ধ স্বরূপ আর বজায় থাকে না। সে হয়ে পড়ে 'ভীষণ খারাপ মেয়েমানুষ'। সেই গভীর পাশের পাতালপুরী থেকে তাকে উদ্ধার করতে আজকের রাম এসে দাঁড়ায় ক্রোশের পর ক্রোশ হাসিল হওয়া কুমারী জমিনের সামনে। হলকর্ষণের রেখা ধরে পঙ্কবাসিনী সীতাকে পুনরায় উদ্ধারের শপথ নেয় নতুন কালের নায়ক রামচন্দ্র।

প্রায় একশ'বছর ব্যাপ্ত কাহিনিতে মহাকাব্যিক বিস্তার ও গভীরতা যথেষ্টই রয়েছে। উপন্যাসটি পাঠের সময় বারবারই বাংলা সাহিত্যের আরো দুটি উপন্যাসের কথা স্মরণে আসে; বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আরণ্যক' ও সতীনাথ ভাদুড়ীর 'ঢোঁড়াই চরিত মানস'। আরণ্যকের গল্প বাংলাদেশের বাইরের হলেও সেখানে বহিরাগত অনভিজ্ঞ সত্যচরণের দৃষ্টি দিয়ে এক অজানা ভূমি-প্রকৃতি মানুষকে আবিষ্কারের গল্প রয়েছে। সেখানেও প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই, কৃষিভূমির বিস্তার, স্থানীয় গরীব সরল মানুষদের জীবনসংগ্রাম, সদ্য গড়ে ওঠা জনপদে সভ্যতার বৈষম্যগুলির আত্মপ্রকাশ, সর্বোপরি অরণ্য ধ্বংসের কথা আছে। অবশ্য 'আরণ্যক' উপন্যাসের পাঠ শেষের আস্বাদ ভিন্নরকম। অন্যদিকে 'ঢোঁড়াই চরিত মানস' উপন্যাসের নায়ক ঢোঁড়াইয়ের সঙ্গে এ কাহিনির রামচন্দ্রের গভীর সাদৃশ্য পাওয়া যায়। ঢোঁড়াইও অবশ্য রামচরিতমানসের রামচন্দ্রের আধুনিক পরিবেশে পুনর্নির্মাণ। বিশশতকের তিন-চারের দশকের উত্তর ভারতের লোকজীবনেব রাজনৈতিক, আর্থ-

সামাজিক পরিবেশ ঢোঁড়াইয়ের প্রতিষ্ঠা। তারও স্বজনহীন, প্রেমহীন শূন্য জীবনের ট্র্যাজেডি তাকে পাক্কির পথ ধরে আগামী ভারতবর্ষের কর্মযজ্ঞের দিকে টেনে নিয়ে গেছে। ব্যক্তিগত জীবনের বেদনা, একাকীত্ব এবং বৃহত্তর জনতার মাঝে কর্মের প্রেরণায় নিজেকে ডুবিয়ে দিয়ে সেই ব্যক্তিগত ঝড়কে ভোলবার প্রয়াসেই মুক্তির সন্ধান— ঢোঁড়াই ('ঢোঁড়াই চরিত মানস'), রাম ('নদী মাটি অরণ্য')— দুইটি চরিত্রেরই পরিণতি এমনই— আদি মহাকাব্যের নায়কেরই অনুরূপ।

নকুল খুড়ো বলেছিল,—

'কুনঠে আর হারাইবা, যি দিশেই যাও, ঘুইরে ঘুইরে আবার ফিইরে আসব্যা নিজির কাছে। নিজির কাছ থিক্যা পালাবার কুনো পথ নাই।'

অশিক্ষিত ভবঘুরে মানুষটি বহু দেশ-নদী-প্রান্তর-জনপদ এতোলবেতোল ঘুরে বেড়িয়েছে, জীবন বিষয়ক অভিজ্ঞতা আর বোধ জীবনের কাছ থেকেই সরাসরি অর্জন করা। আর সরল আত্মগত ভাষ্যে যে আশ্চর্য সত্য উচ্চারণ, উপন্যাসের কাহিনিতেও সেই সত্যেরই সমর্থন পাওয়া যায়। জীবন তো এরকমই; প্রবহমান, কিন্তু বৃত্তাকার। মানুষ যেখান থেকে শুরু করে আবার তাকে সেই জন্ম-মৃত্যুর দুয়ারে এসেই সমাপ্তি টানতে হয়। সুন্দরবনে প্রকৃতির নিভৃত ঘেরাটোপে আবদ্ধ জলা-জঙ্গলের ইতিহাসেরও তো একই ভবিতব্য। পৃথিবীর বৃত্তাকার পরিভ্রমণের পুরনো পথ যেমন ফিরে ফিরে আসে তেমনই সুন্দরবনের ভৌগোলিক ইতিহাসটি পুনরাবৃত্ত হয়। এই আদিম বাদা অঞ্চল একসময়ে ছিল গমগমে শহর, বাণিজ্যের প্রাণকেন্দ্র; অন্তত জনশ্রুতি তাই বলে। প্রকৃতিকে নির্বাসিত করা সেই সভ্যতার অহমিকা একদিন প্রকৃতির হাতেই ধুয়ে মুছে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়েছে; প্রকৃতি হৃতভূমি পুনর্দখল করেছে।

'তারপর বহুকাল পর, একটু একটু করে মহাকাল সেই সভ্যতার অবশেষ— শুধুমাত্র মাটিটুকু তুলে এনেছে সমুদ্রের বুক থেকে।'

পুনরায় সেই মাটিতে মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার পালার শুরু; সুন্দরবনে বিঘের পর বিঘে জমিন হাসিল হয়েছে; ভবিষ্যতে পুনর্বার সভ্য মানুষ তার গর্বিত পদধ্বনিতে নস্যাৎ করে দিতে চাইবে জল-মাটি-অরণ্যের আদিম শক্তিকে। তার জন্য খেসারৎ-ও দিতে হবে বারবার। এই পুনরাবৃত্তির ভবিতব্য মানুষেরও নয় কি? যে কপর্দকশূন্য ভাগ্যান্বেষী মানুষের দল একফালি নিজস্ব জমির প্রত্যাশায় এক স্থান থেকে অন্য স্থানে বছরে পর বছর ছুটে গেছে, দুর্গম প্রান্তিক ভূমিখন্ডে মাটি কামড়ে পড়ে থেকেছে, জমিন হাসিলের পরও তাদের নিঃস্ব অবস্থার এতটুকু বদল ঘটেনি। ব্যক্তি মানুষের নিয়তিও গোষ্ঠী-মানবের থেকে ব্যতিক্রমী কিছু হয়নি। সীতাবালা! প্রায় দুই যুগ আগে যে শিশুসন্তানকে ফেলে

রেখে অন্য পুরুষের আকর্ষণে অকুল দরিয়ায় ভেসেছিল, যৌবনপ্রাপ্ত সেই সন্তানেরই কামনা ভরা দৃষ্টির সামনে আর একদিন তাকে দাঁড়াতে হল।। ভবিতব্যকে এড়াতে পারেনি রামও। মায়ের যে পদস্খলনের বিচার করতে তরুণ বয়সে তার অজানা দ্বীপভূমিতে গমন, সেই মায়ের সামনে অজান্তেই তার নিজেরও বিচ্যুতি ঘটেছে—

'তার মায়ের যে স্তন পান করে সে জীবনের প্রথম দেড় বছর অতিক্রম করেছে, সেই স্তন দেখেই কিনা সে, মুগ্ধ হল এক পুরুষের মতো!'

অথবা বিভাবরী! চরিত্রহীন স্বামীর ঘরে সম্পদের খাঁচায় বন্দি বিভাবরী প্রেমের অধিকারেই মুক্তি চেয়েছিল। কিন্তু সেখান থেকে বাদাবনের দেশে রামহরি নায়েবের হাতে নতুন করে বন্দি হওয়ার দুঃস্বপ্নের থেকে তার মুক্তি ঘটল কোথায়! জীবন বোধ হয় এমনই। ভাঙা-গড়ার মধ্য দিয়ে সে এগিয়ে চলে— সাময়িক লাভ-ক্ষতির চুলচেরা বিশ্লেষণে প্রমত্ত মানুষ টেরই পায় না— একদিন শূন্যতেই তাকে শেষ করতে হবে— প্রথম দিনেরই মতো— এই-ই মানুষের নিয়তি।

লেখক কাহিনির মধ্যে উনিশ শতকের বাংলাদেশের এক অংশের ছবি তুলে ধরেছেন; বাঁচার তাগিদে এক কঠিন মরণপণ লড়াইতে সামিল হওয়া মরিয়া কিছু মানুষ; দিন গুজরানের ন্যূনতম কিছু প্রয়োজন মেটানো আর আদিম কিছু জৈবিক তাড়নার বাইরে এদের অধিকাংশের জীবনেই বাঁচার আর কোনো তাৎপর্য নেই। তবুও তাদের বন্য জীবনেও ভিন্ন কিছু সুরের ছোঁয়া লাগে বৈকি! যেমন মোহনায় এসে নদীর অন্তরে প্রবেশ করে সমুদ্রের ডাক; নদী তখন বদলিয়ে যায়—

'থির হয়ে থাকা জলে সহসা ঢেউয়ের উথাল-পাথাল দমক! মানুষও এমনই বেভুল বিবাগী হয়ে পড়ে। সুন্দরবনের ঘোষড় জঙ্গল, বাঘের ভয়, নায়েব-গোমস্তার শোষণ— সবকিছুকে আত্মস্থ করে নিয়ে এসবের ঊর্ধ্বে উঠে যাওয়া মানুষ— বংশী, নকুল খুড়ো, একাদশীরা। বংশীর বাঁশির সুরেলা ধ্বনি তরঙ্গায়িত হয়ে ছড়িয়ে পড়ে— অরণ্যের হৃৎকন্দর পর্যন্ত আবিষ্ট হয়ে যায়। মা-হারা বংশী কিংবা সর্বস্ব হারানো নকুল খুড়ো— এদের কাউকেই শেষে সুন্দরবনের নদী-মাটি-অরণ্য ধরে রাখতে পারেনি। আশ্চর্যভাবে এই চরিত্রদের কেউই বনানী, আকাশ, জলকে নিছক জীবনযুদ্ধের বিষয় করে দেখেনি, নিবিড়ভাবে অনুভব করেছিল—

'না আসলি জানতি পারতাম না, গাঙ আর জঙ্গল কেমুন গোপনে গোপনে ভাব-ভালোবাসা করে।'

গহীন গাঙ আর ধূ ধূ বেবাক জমির মধ্যে যে অসীম শূন্যতা— প্রকৃতির অন্দর থেকে মানুষের জীবনেও তার প্রবেশ ঘটেছে। লবঙ্গলতাকে দেখে রামের অন্তরে যে ব্যাখ্যাহীন

বেদনা, অরণ্যের ক্রমিক অপসারণে একাদশীর চোখে নেমে আসা ধূসরতা, নকুলখুড়োর ভবঘুরে জীবন থেকে আরো বড় মহাজীবনের উদ্দেশ্যে যাত্রা অনুভব করায় যে, কোনো কিছুর ওপরই শেষ পর্যন্ত মানুষের নিজস্ব নিয়ন্ত্রণ থাকে না। বিরাট প্রকৃতির সামনে দাঁড়িয়ে মানুষ যেন বারবারই নিজের ক্ষুদ্রতা আর নিরুপায়ত্বকে চিনতে পারে; পরিশেষে ভেসে চলাটাই যে তার অনিবার্য বিধিলিপি— সেই সত্যের মুখোমুখিও মানুষকে কোন এক সময়ে হতেই হয়— যেমন হয়েছে এই গল্পের মুখ্য চরিত্রদেরও।

মাটি-সংলগ্ন জীবনের বর্ণনায় এই কাহিনিতে লেখক ভাষাতেও মাটিরই গন্ধ বুনে দিয়েছেন। একেবারেই গ্রামীণ প্রান্তিক জনের সে ভাষায় শহুরে পালিশের কৃত্রিমতা নেই বলেই তাতে অন্তর্গত প্রাণের স্বরূপটি ধরা পড়ে অতি সহজেই। স্পষ্টতা আর সারল্যই এই ভাষার শক্তি—

'মস্ত সবুজরঙা পালের পেট একবার উত্তুরে হাওয়া লেগে ভরা পোয়াতির মতো ফুলে ঢোল, তখন তরতর করে বোট ছুটছে তো ছুটছেই, পরক্ষণেই দখ্নে হাওয়ার দাপটে সে পেট অমনি খালাস।'

তথাকথিত শ্লীলতা রক্ষার পরিবর্তে নিখুঁত ছবি আঁকার প্রতিই এই ভাষার মনোযোগ। প্রবল খিদের বর্ণনায় যে প্রকার উপমা ব্যবহার করা হয়েছে তার মধ্যেও গ্রামীণ মানুষের শিল্পবোধই প্রাণ পায়—

'এক পেট বুনো খিদের কাছে এক ফালি নারকেল মিলিয়ে গেল হাওয়ার মতো। এ যেন ষাঁড়টাকে দাবনায় খোঁচা দেওয়া।'

স্বভাবতই আঞ্চলিক সংলাপই চরিত্রের মুখে লেখক প্রয়োগ করেছেন। পুরো উপন্যাস জুড়েই এমন উদাহরণের ছড়াছড়ি—

'রামহরি জানা চোখে শঙ্কা ফুটিয়ে বললেন, তুমি কিটো বইল্যে!

— কয়ে দেলম, হয়িঠে হুজুর, কের্‌মে কের্‌মে হয়িঠে। তেনাদের এত্‌তো উপদ্দুরুব।'

এমন কিছু বিশেষণ রয়েছে যা শহরের শিক্ষিত রুচির কাছে মোটা দাগের বলে চিহ্নিত হয়ে; কিন্তু সেই শব্দগুলিরও নিজস্ব সৌন্দর্য রয়েছে। 'আন্‌কা ভয়তরাস', 'উদ্‌লা ডা ডা মাটি', 'হাঁতহাঁত' করে খাওয়া, বিদ্যুৎ 'চিক্কির' দেওয়া, 'ফিনফিনে' সাপ, রোদ মেখে 'টং' হয়ে থাকা, 'উম্‌সুম্' জঙ্গুলে টান— এরকমই অজস্র ব্যবহার ঘটেছে উপন্যাসে। এর বাইরে লেখকের নিজস্ব বর্ণনার ভাষাও কিছু কম শক্তিশালী নয়। গভীর জঙ্গলে জ্যোৎস্না ভরা রাতের বিবরণ যেমন—

'রূপো রঙের গুঁড়ো গুঁড়ো রেণু তখন ঝরে পড়ছে মানচিত্রের সবুজ রঙে, ঘরে মেঝেয়, তাদের দুজনের গায়ে।.:. সারা জঙ্গলে তখন আঁধার কেটে গিয়ে সেই রূপোলি

ইলশেগুঁড়ি। আর সবুজ ঘন জঙ্গলের ঠিক মগডালে আটকে রয়েছে একটা মস্ত গোল মতোন চাঁদ।'

অথবা, সোঁদরবনে এসে নিজের গর্ভধারিণীর পরিচয় নাটকীয়ভাবে জানার পর রামের সমগ্র অস্তিত্ব জুড়ে যে ভূমিকম্প, তার বর্ণনায়—

'এমন একটা ঝড় উঠুক যার প্রলয়ে তছনছ হয়ে যাক শরীর, আর চারপাশের অস্তিত্ব, তার বেঁচে থাকা- সব। এখন মুষলধারে বৃষ্টি নামুক, ভয়ঙ্কর বাণে ধ্বংস হয়ে যাক সমস্ত জঙ্গল। মানুষ, লোকালয়, তাবৎ পৃথিবীটাই। এই পাপবিদ্ধ সময় এক ভীষণ সময়।'

সত্তর মূলকে ছুঁয়ে যাওয়া এই ভাষায় অকারণ কবিত্ব, বিশেষিত জটিলতা, আরোপিত স্বাতন্ত্র্য নেই। বাদাবনের প্রাকৃতিক জল-হাওয়ার শক্তিতে পুষ্ট, স্থানীয় মানুষগুলির মতোই স্ব-ভাবে উজ্জ্বল এই ভাষা।

সদ্য সুন্দরবনের ওপর শ্রী তুষার কাঞ্জিলালের একটি লেখা ('বিপন্ন সুন্দরবন শুধু টাকা ঢাললে হবে না') আনন্দবাজার পত্রিকায় (২৫.৫.২০১১) প্রকাশ পেয়েছে। সুন্দরবনে অর্ধশতক ধরে বাস করা এবং সুন্দরবনের আত্মার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ মানুষটির সংক্ষিপ্ত লেখায় জনবসতি গড়ে ওঠার জন্মলগ্ন থেকেই সেটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। প্রাকৃতিক, ভৌগোলিক স্বাতন্ত্র্যকে মেনে সুন্দরবনের উন্নতি হয় নি কোনোদিনই। 'নদী মাটি অরণ্য' সুন্দরবনের প্রবহমান ইতিহাসের অংশবিশেষ বা প্রাথমিক পর্ব মাত্র। কিন্তু এই কাহিনিতে লেখক যা সূচনা দেখিয়েছেন সেই প্রকৃতি-মানুষে লড়াই করে বেঁচে থাকার গল্পটি প্রায় দেড়শ' বছর পরে স্বাধীনতা উত্তর দেশেও একই রকম থেকে গেছে। বদলায়নি 'হতদরিদ্র ভূমি-কাঙাল লক্ষ লক্ষ মানুষের বেঁচে থাকার এবং টিকে থাকার লড়াই।' আঞ্চলিক জীবন-সত্যের ওপর আলোকপাত করা এই উপন্যাসটি সেই কারণেই আজও অত্যন্ত সময়োপযোগী।

□ **লেখিকা গবেষিকা, বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক, অধ্যাপিকা, নিউ আলিপুর কলেজ।**